**শিশু অধিকার রক্ষা আমাদের দায়িত্ব**

সফিউল আযম

শিশুরা হচ্ছে সমাজের সবচেয়ে দুর্বল অংশ। প্রয়োজনে কিংবা অপ্রয়োজনেই হোক কারণে অকারণে বিভিন্ন অনৈতিক অপরাধেও তাদের সহজেই ব্যবহার করা যায়। পরিবারে, সমাজে এমনকি রাস্তায়ও এরা নির্যাতন ও শোষণের শিকার হচ্ছে। বলা হয়ে থাকে, সমাজের শক্ত অবস্থান আসীনদের দ্বারা শিশু অধিকার বেশি লঙ্ঘিত হয়। ফলে সাধারণ লোকের পক্ষে তাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া বা এর বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তোলা প্রায় ক্ষেত্রেই অসম্ভব হয়ে পড়ে। শিশুরা সবসময় দুর্বল চিত্তের অধিকারী হয়ে থাকে তাই তাদের কথা বলার সাহস থাকে না। প্রতিবাদের ভাষা ও প্রতিরোধের ক্ষমতা নেই তাদের। তারা নির্বাক তাদের কোনো অসঙ্গতি দূরে হটাবার বুদ্ধি বা ক্ষমতা থাকে না। নিরবে সয়ে যায় শত নির্যাতন।

শিশুরা জানা অজানা অনেক নির্যাতনের শিকার হয়। তবে এই নির্যাতনের খবর খুব বেশি প্রকাশিত হয় না। কারণ শিশু নির্যাতনের ঘটনাগুলো অনেকটাই ঘটে লোক চক্ষুর আড়ালে। যার ফলে নির্যাতনের ধরন কিংবা সংবাদ থেকে যায় সবার অগোচরে। শিশুর উপর কোনো ধরনের শারীরিক বা মানসিক আঘাত, অবহেলা, দুর্ব্যবহার, আটকে রাখা, যৌন হয়রানি, অনাহারে রাখা ইত্যাদিকে শিশু নির্যাতন হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। সবচেয়ে দুঃখজনক হলো আমাদের অনেকেই বুঝতে পারেন না যে, তাঁরা নিজের অজান্তেই বিভিন্নভাবে শিশুদের নির্যাতন করে থাকেন। যিনি নির্যাতন করেন তিনিও বুঝতে পারেন না, যা করছেন তা শিশুদের নির্যাতনের আওতায় পড়ে।

শিশুদের যে বিশেষ যত্ন আর পরিচর্যার প্রয়োজন রয়েছে তা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি পায় অনেক আগেই। লীগ অব নেশনস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ১৯২৪ সালে জেনেভা কনভেনশনে প্রথম শিশু অধিকার সংক্রান্ত ঘোষণা দেওয়া হয়। ১৯৫৯ সালে জাতিসংঘ শিশু অধিকারের নীতি ঘোষণা দেয়। শিশুদের ইচ্ছা ও অধিকারের প্রতি সম্মান ও আস্থা জানিয়ে পরবর্তিতে ১৯৮৯ সালের ২০ নভেম্বর আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার কনভেশনে প্রথম শিশুদের গুরুত্বপূর্ণ অধিকার মৌলিক অধিকার হিসেবে লিখিতভাবে গৃহীত হয়। জাতিসংঘের পক্ষ থেকে ১৯৭৯ সালকে আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ এবং ১৯৭৯-৮৯ সময়কালকে শিশু দশক হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়। শিশু দশকের শেষ দিকে ১৯৮৮ সালে সাধারণ পরিষদে পোল্যান্ড শিশুদের জন্য পৃথক সনদ প্রণয়নের প্রস্তাব উত্থাপন করে। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়।

শিশু অধিকার ঘোষণায় ১৯৫৯-এর ১০টি অধিকার সম্পাদনা করে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ একটি সর্বসম্মত খসড়া প্রণয়ন করে। আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার সনদ হিসেবে তা ১৯৮৯ সালের ২০ নভেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সাধারণ পরিষদের সভায় উপস্থিত ১৭৮ জন রাষ্ট্র বা সরকার প্রধান ওই সনদের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানান। ১৯৯০ সালের ২৬ জানুয়ারি সনদের মূল দলিলটি সদস্য রাষ্ট্রগুলোর স্বাক্ষর, অনুসমর্থন ও জাতিসংঘ নীতিমালায় অন্তর্ভুক্তির জন্য উন্মুক্ত করা হয়। ১৯৯০ সালের ৩ আগস্ট বাংলাদেশ এই সনদে অনুস্বাক্ষর করে। সনদের ৪৯ অনুচ্ছেদ অনুসারে ১৯৯০ সালের ২ সেপ্টেম্বর এই সনদ জাতিসংঘের একটি কার্যকর দলিলে পরিণত হয় এবং স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রগুলোর ওপর এটি আইনি বাধ্য বাধকতার মর্যাদা লাভ করে। মোট পাঁচটি মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ প্রণীত হয়। এই পাঁচটি নীতি হলো, শিশুর বেঁচে থাকা ও বিকাশ, বৈষম্যহীনতা, শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ, শিশুর অংশ গ্রহণ, জবাবদিহিতা।

জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদে অনুসমর্থন দানকারী প্রথম ২২টি দেশের একটি হলো বাংলাদেশ। অথচ বাংলাদেশে শিশুরা নানাভাবে নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। পক্ষান্তরে শিশুরাই আমাদের ভবিষ্যৎ, জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধার ইত্যাদি কথা বলে থাকি আমরা। বর্তমান সরকার শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠা ও রক্ষায় নির্বাচনি ইশতেহারে বেশকিছু অঙ্গীকার করেছে এবং সেসব বাস্তবায়নে নানাবিধ কার্যক্রমও গ্রহণ করেছে। শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য দেশের প্রতিটি নাগরিককে সচেতন করার জন্য আরো উদ্যোগ গ্রহণ প্রয়োজন।

-২-

১৯৭৪ সালের ডিসেম্বরে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। যুদ্ধকালীন অবস্থায় বা কোনো দুর্যোগের সময় শিশুদের রক্ষা করার জন্য বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। সে কারণেই বাংলাদেশে শিশু আইন-১৯৭৪ প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তীতে প্রণীত শিশু আইন ২০১৩ একটি যুগান্তকারী আইন যেখানে শিশু অধিকারের বিষয়গুলোকে সরকার বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে।

জাতিসংঘ সদর দফতরে ২০০২ সালের মে মাসে শিশুদের জন্য যে বিশেষ সেশন আয়োজন করা হয়েছিল, তার আদলে আমাদের জাতীয় সংসদেও শিশুদের জন্য বিশেষ সেশন আয়োজন করা যেতে পারে, যা আমাদের দেশের জনগণের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগাতে সক্ষম হবে। শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও রক্ষায় সরকারি এবং বেসরকারি গণমাধ্যম কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। বাংলাদেশে শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সমন্বয়ে বহুমুখী কার্যক্রম হাতে নেওয়া প্রয়োজন। আমাদের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা কারিকুলামে শিশু অধিকার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা যেতে পারে, যাতে শিশু অধিকার সম্পর্কে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং উদ্বুদ্ধকরণ সহজ ও সম্ভব হয়। জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ প্রচারের জন্য প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র সংসদের আদলে চাইল্ড কাউন্সিল গঠন আংশিকভাবে কার্যকর হলেও পুরোদমে সারা দেশে এটি বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। অন্যদিকে শিশু ন্যায়পাল নিয়োগও দীর্ঘদিনের দাবি। এ দাবি পূরণের মাধ্যমে সিআরসির প্রচার ও বাস্তবায়নে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব।

শিশু অধিকার সনদ এবং সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল (এসডিজি) এ অন্তর্ভুক্ত অনেকগুলো লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে শিশু অধিকারের বিষয়গুলো বিবেচনায় নিতে হবে। আর শিশু অধিকার বাস্তবায়ন করতে হলে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। সরকারের দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক পরিকল্পনাতে গ্রামভিত্তিক অর্থনীতিকে আরো জোরদার করার নানা কর্মসূচির পাশাপাশি দারিদ্র্যের যাতাকল থেকে মুক্ত হতে পারলেই সব ধরনের শিশু অধিকার বাস্তবায়ন সহজ হয়ে যাবে।

শিশু নির্যাতন শিশুদের উপর নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। যেমন- শারীরিক বিকাশ বাধাগস্ত হয়, অনেক সময় শিশু পঙ্গু হয়ে পড়ে ও মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হওয়াসহ অল্পবয়সে নেশাগস্ত হয়ে পড়ে। এতে শিশুর নৈতিক বিকাশ ঠিকমতো হয় না, প্রতিভা, মেধা ও উদ্ভাবনী শক্তি হ্রাস পায়, শিশুর অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পায়, অসামাজিক কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়ে এবং অনেক সময় সহিংসতার শিকার হয়ে মৃত্যুও হয়।

সর্বোপরি প্রতিটি শিশুকেই মনে করতে হবে তারাই আমাদের ভবিষ্যৎ। পেশা, সামাজিক অবস্থান, মর্যাদা নির্বিশেষে সমাজের সব মানুষকে প্রতিটি শিশুর প্রতি আরও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতে হবে। নিজ নিজ অবস্থান থেকে দেশের প্রতিটি নাগরিককে শিশু অধিকার রক্ষায় কাজ করে যেতে হবে। সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সুরক্ষিত শিশু অধিকার সম্পন্ন বাংলাদেশ নির্বিমাণে আমরা সবাই সচেষ্ট থাকবো মুজিববর্ষে এটাই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

#

২৪.০২.২০২০ পিআইডি ফিচার